পরিবিষয়

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

মিনারচূড়োর পরী-২

সুশান্ত আর অনিমেষের মতো আরো পরী আছে গোটা শহর জুড়ে। থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের আমি দেখতে পাইনি কোনোদিন। কেবল যখন ওদের দুজনকে কখনো সখনো দেখেছি, যেমন ধরা যাক একদিন দেখেছিলাম রবীন্দ্র সদনের বাইরের বাসস্টপে; অনেক রাতে একদিন; সেদিন বাসস্টপে আরো একজন ছিলেন। এক মহিলা। তিনি অত রাতেও অত অল্প আলোর মধ্যেও, ওখানে দাঁড়িয়ে উল বুনছিলেন। আমার স্থির ধারণা সে মহিলাও এক পরী। অলৌকিক। অশরীরী।

এখন, কীভাবে সুশান্ত ও অনিমেষ এক অদৃশ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে মানুষের জীবনের ওপর প্রভাব ফেলছে, কীভাবে তাদের মধ্যে সম্পর্ক, অনুভূতি তৈরি করছে, কীভাবে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক স্মৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে - এসব আমাকে আজও ভাবায়। এর কোনো দৃঢ় জবাব আজও পাইনি। কিন্তু এটুকু বুঝি কম্প্যুটর আসার আগে, ধরা যাক ১৯৭৭ সালে, যদি কাউকে আজকের ল্যাপটপের কথা বর্ণনা করা হতো তার যেমন রূপকথার মতো বা গ্যাঁজাখুরি লাগতো, এও সেরকম। যে প্রক্রিয়া ও/অথবা যন্ত্র ব্যবহার ক'রে ওরা এত মানুষের এত ব্যক্তিগত তথ্যের খোঁজ রাখে সেটা এই আজকে দাঁড়িয়ে আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব না।

সেই অদৃশ্য যন্ত্র কোথায় থাকে জানিনা তবে তথ্যটা থাকে শহরের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে। এটা আমি লক্ষ্য করেছিলাম। আর কিছু বোধহয় শহরের পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে। গ্রন্থাগারে এসব তথ্য কিন্তু বইয়ের ভাঁজে ভাঁজেই থাকে। শুকনো ফুলের মতো। কেবল সেই চ্যাপটা, শুকনো ফুল বা পুষ্প-সিডি অদৃশ্য। তাদের দেখা যায় না।

এমনই একটা গ্রন্থাগারের নাম, ধরা যাক, 'ম্যাকমোহন-তর্কালঙ্কার পুস্তকসমাহার'। উত্তর কলকাতায়। সেই গ্রন্থাগারে নিয়মিতদের কয়েকজনের কথা বলি। সন্দীপনবাবুর বয়স ৬৩। বহু বছর এই গ্রন্থাগারে আসেন। স্ত্রী-বিয়োগের পর আরো বেশি। সন্দীপন নিঃসন্তান। মুন্নির ভালো নাম অমেয়া সমাদ্দার। তার বয়স ১৩। বই পড়ার প্রচন্ড নেশা অথচ বাড়িতে বইয়ের ততো চল নেই বলে সে আসে। প্রায় রোজ। 'পুস্তকসমাহার'-এর খুব কাছে ওর বাড়ি। গভীর সন্ধ্যায় কখনো কোনো কোনোদিন বাবা, কাকা বা দাদা বিরক্ত হয়ে এসে ওকে ডেকে নিয়ে যায়। অক্ষয়ার বয়সও ৬৩। তার বাবা ছিলো মুদ্দোফরাস। সেও কলকাতা মিউনিসিপ্যালটির জমাদার। সম্পূর্ণ নিরক্ষর। তবু সে গ্রন্থাগারে আসে অন্য কারণে। প্রতিদিন ৭টায় সে আসে; গ্রন্থাগারের পেছনের দিকে ছোট ঘরে রাখা হিটারে দফায় দফায় চা ক'রে মালিক, কর্মি ও কিছু আজীবন সদস্যকে দেয়; পেছনের দিকের ছোট বাথরুম পরিষ্কার করে আর গ্রন্থাগার বন্ধ হলে ঘর ঝাঁট দিয়ে, বইয়ের ধুলো ঝেড়ে বিদায় নেয়। বাবলু ওরফে অপরূপ মজুমদারের বয়স সবে ১৪। সে সপ্তাহে ২-৩ দিন আসে মূলত কমিক-স্ট্রিপ পড়তে আর বিরল এক একদিন ইস্কুলের বিভিন্ন প্রকল্প-পরীক্ষার প্রয়োজনে। শেষজন মালবিকা খান। মালবিকার বয়স এখনো ৬০ হয়নি, তবে কাছাকাছি। যথেষ্ট সুন্দরী এখনো। চাকরী করেন, অবিবাহিতা। কিছুটা দূরে থাকেন বলে রোজ আসতে পারেন না। তবে সপ্তাহান্তে দু দিনই আসা চাই, এলে অনেকক্ষণ থাকেন।

এই পাঁচ চরিত্রেরই কিন্তু একটা সমস্যা হয় মাঝে মাঝে। এরা কিছু কিছু জিনিস ভুলে যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ ভোলে না। কথাগুলো ফিরে আসে। আসে বলেই এরা বোঝে যে ভুলে গিয়েছিলো, যাচ্ছে, আবার যাবে। বাবলু বাড়িতে এই নিয়ে ইতিমধ্যেই অভিযোগ করেছে। তার বাবা-মা তাকে ব্রেনোলিয়া কিনে দিয়েছে। মুন্নির মনে হয় এই সাময়িক বিস্মৃতি রহস্যরোমাঞ্চ সিরিজের বাসীন্দা হবার কারণেই। সন্দীপন ও মালবিকা ব্যাপারটা বোঝেন বলে মনে করেন, ভাবেন বয়সোচিত স্মৃতিভ্রম। অক্ষয়ার এক একদিন এক একরকম মনে হয়। কখনো সে আফিম, কখনো গাছের ভূত, কখনো লোডশেডিং, কখনো অতিরিক্ত পেঁয়াজ খাওয়া বা আঙুলের বাতের টোটকাকে দায়ী করে। কিন্তু ভুলে যাওয়ার অসুখ বা তার জন্য দুশ্চিন্তাকেও সময়ই ভুলিয়ে দেয়।

====

Time heals all
But what if time itself is the disease

Behind closed eyes
Close your eyes once more
And even the stones come alive

The world seems to be sinking into dusk
But I tell my tales as in the beginning
In my singsong voice which sustains me
Saved from the very tales by present troubles
And protected for the future.

====

‘সময় ভুলিয়ে দেয়’ যারা ভাবেন তাদের এটা বুঝিয়ে দেওয়া জরুরী আসলে কাদের হাত এই ভুলিয়ে দেওয়ার পেছনে। এবং কী তাদের উদ্দেশ্য। যেমন মুন্নি। কেন সকলে তাকে ভুলে গেছে। ‘ম্যাকমোহন-তর্কালঙ্কার পুস্তকসমাহার’, তার পাড়া, তার বাবা-মা আত্মীয়স্বজন ইস্কুল। এক বাবলু ছাড়া। মুশকিল হলো স্মৃতি স্বয়ংক্রিয় ও ধ্রুব হলে তবেই মানুষ তাকে অতীতের-বর্তমান মনে করে, স্বপ্নের সাথে আলাদা করে। বাবলু মাঝে মাঝেই ভুলে যায় মুন্নিকে। আবার একদিন মনে পড়ে। সে বুঝতে পারেনা মুন্নি একদা-বাস্তব কিনা। সেই দুপুরের কথা তার মনে মাঝে মাঝে আলতো মেঘের মত আসে। গল্পের মতো সে দুপুর। বিকেল। তার আবহাওয়া...

আর এই দুপুরেই সেদিন, আরো অনেক দিনের মতো পুস্তকসমাহার-এ এসেছিলেন সন্দীপন ও মালবিকা। বই বা পত্রিকা মুখে ডুবে থাকাকালীন সেই দুপুরে তারা জানতেও পারেন নি তাদের একটা হাতের কী পরিণতি হতে চলেছে। জীবনের বাকী সময় জুড়ে যে অপাহিচের কাটা-হাত বা প্রস্থেটিক-পায়ের মতো তাদের লুকিয়ে রেখে চলতে হবে নিজেদের একটা অঙ্গ। সন্দীপনের ডানদিকেরটা আর মালবিকার বাঁ। এসব ওরা জানতেন না। কিন্তু সেদিন ওঁরা মুন্নিকে দেখেছিলেন। দেখে চিনতেও পেরেছিলেন। মেয়েটি তো রোজ আসতো। অথচ আজ আর মনে নেই সন্দীপনের, মালবিকার, সেই মেয়েটিকে, তার অস্তিত্বকে...

মনে নেই অক্ষয়ারও। অথচ প্রায় রোজ পুস্তকসমাহার-এ ফিসফিস করে মেয়েটার সাথে তার কথা হতো। তার নাতনীর চেয়েও ছোট ছিলো মুন্নি। মেয়েটা চেয়ে চেয়ে দেখতো যখন আজীবন সদস্যদের টেবিলে চা নামিয়ে রাখতো অক্ষয়া। শেষে একদিন মেয়েটাকে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করে - 'খাবে'? মুন্নি ইতিবাচক ঘাড় নাড়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে। সেই থেকে প্রায় রোজই আধ-কাপ চা মেয়েটাকে চুপিচুপি দিয়ে যেত অক্ষয়া। আর সবার আগে ওর কাপটাই তুলে নিয়ে যেত। সেদিন অবশ্য দুপুরে মুন্নি চা খায়নি কেননা অক্ষয়া, আগেই বলেছি, আসতো সন্ধ্যা সাতটায়। সেদিন মুন্নি...

সেদিন মুন্নিকে, দুপুরের যখন সন্ধে, বাবলু এসে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলো। বাবলু উত্তেজিত ছিলো কেননা আগেরদিন সে নিজের চেষ্টায় একা ঘুড়ি ওড়াতে পেরেছিলো বাড়ির ছাদ থেকে। পাড়ার দাদারা, দিদিরা তাদের ছাদেই আসতো বেশি। তাদের ছাদই ছিলো ঘুড়ির লঞ্চপ্যাড। তবু এদের কারো সাহায্য না নিয়েই মুখচোরা বাবলু একদিন, স্রেফ নিজের চেষ্টাতেই ঘুড়ি ওড়াতে শিখেছিলো। সেই দুপুরে ভালো হাওয়া দেখে তার আবার ছাদে যাবার ইচ্ছে হয়। মুন্নিই তার একমাত্র বন্ধু, তাই তার কাছে আসা। 'চল ওড়াবো, আমি শিখে গেছি, তোকেও দেখিয়ে দেব' - এই বেদবাক্যই ছাদে ওঠার প্রেরণা। ছাদে একটা বাথরুম ছিলো। আর পাশেই একটা ঘর। সেখানেই দেয়ালে লাগানো তাকের ওপর থাকতো ঘুড়ি। অনেক ঘুড়ি। পাড়ার ঘুড়ির ক্লাব ওখানেই। দুজনে ঘরে ঢুকে সেদিন টের পায় ওদের পৌঁছের মধ্যে নয় সেই তাক। পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর দাঁড়ালে দুটো-একটার ধার ছোঁয়া যাচ্ছে ঠিক, কিন্তু ঘুড়ির পালের ওপর হয় ভারী ইঁট নয় কাঁসার ঘন্টা রাখা আছে, আর তার ওপর বেতের ঝুড়ি চাপা দেওয়া। মুন্নি একটা ছোট স্টুল যোগাড় করে, বাবলু উঠে একটা হলুদ-সবুজ চাঁদিয়াল পাড়তে যায়। আর ঠিক এই সময় হুড়মুড় করে দুটো ঘন্টা ওদের ওপর পড়ে...

যেটা বলা হয়নি সেইসব মাচার ওপর বেশ কিছু পায়রার বাসা। ঘরের দুটো জানলাই ভাঙা। পায়রা ঘুড়িতে ঠোঁট দেয় না বলে এ নিয়ে কেউ কিছু করেনি আর। সব যখন ঘাড়ের ওপর পড়ে কাঁসার ঘন্টা শুদ্ধু, আচমকা শব্দোচ্ছ্বাসে সন্ত্রস্থ সমস্ত পায়রা সারা ঘোরে উড়ে বেড়াতে থাকে। দুজনে মাটিতে আছাড় খায় ও ক্ষণমূহূর্তে জ্ঞান হারায়। আর সেই মাটিতে আছাড় খাওয়া কাঁসার ঘন্টা তখন বার তিনেক ঘোরে ডিগবাজি খেয়ে, ঘর হেকে ছিটকে, সিঁড়ি দিয়ে এক তীব্র, মিষ্টি, করাল ধ্বনিচক্র তুলে...

এই সমস্ত ঘ'টে যাওয়ার মধ্যেই আকাশ দু একটা ঘন মেঘের খোঁপা বেঁধে ফেলেছে। আর সিঁড়ি দিয়ে গড়ানো ঘন্টার তীব্র তোপে শুধু যে গোটা পাড়া জেগে ওঠে তাই নয়, জটামেঘ ফেটে যায়। তোড়ে বৃষ্টি আসে। ছাদের ঘরের ভাঙা জানলা দিয়ে সজোরে ছাট আসতে থাকে। তাতে ভিজে বাবলুর জ্ঞান ফিরে আসে। দেহের ব্যাথায় সে উঠতে পারেনা কিন্তু সবার প্রথমে শুনতে পায় ঘন্টাধ্বনি আর বৃষ্টির শব্দ। তারপর আশেপাশে দেখে ভেজা ঘুড়ি আর তার ঠিক বুকের কাছে নাকের ওপর একটা বাঁশের কঞ্চির ওপর মুন্নির পা। সেই পা থেকে রক্ত গড়ায়, মুন্নির মাথা থেকে অনেক রক্ত গড়িয়ে সে জায়গায় এক ছোট লালপুল। এই সময় বাবলু আবার জ্ঞান হারায়। তার চেতনার মধ্যে আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসে ঘন্টাধ্বনি আর রক্ত-পড়া পা। আর ঠিক এই সময় অনিমেষ আর সুশান্ত ...

ঠিক এই সময়, ওরা ঘোরে ঢুকে এসে মুন্নিকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে যায়। ওর পড়ে থাকা চটিও। কিন্তু মুন্নির রক্ত মুছতে ওরা ভুলে যায়। পরের দিন যখন ঘর মোছা হচ্ছে, পুলিশকে যদি ডাকা হতো; তারা যদি ডি-এন-এ টেস্ট করতো ঘুড়িঘরে বাবলু ছাড়া আরো একজনের উপস্থিতি টের পাওয়া যেত। যাকে সবাই সেই ঘন্টা-পড়ার মুহূর্তেই ভুলে গেলো। মুন্নির সবচেয়ে ঘন বন্ধু পাশের বাড়ির সঞ্চয়ী ওর কথা ভুলে যায় সেদিন। ভুলে যায় গোটা পাড়া। সব অ্যালবাম থেকে মেয়েটার ছবি হাপিস হয়। কেবল বাবলুর কি যেন আজো উঠে যাওয়া জলছবির মতো, এক প্রস্থ চুনকাম করা দেয়ালের নিচের গ্রাফিত্তির মতো মনে থেকে যায়। একটা গড়িয়ে পড়া – জানলা বেয়ে জলের, কপাল বেয়ে রক্তের, সিঁড়ি বেয়ে কাঁসার ঘন্টার গড়িয়ে পড়া...

====

অবতলে
বিন্দু গড়িয়ে পড়ছে হাসের পালক ঝকঝকে
বাড়ি বাড়ি এখন তারাই পোষ্য
নিশ্চুপ নিরবচ্ছিন্ন নির্বাক হংসীরা

পতাকা পালটে পালটে জাহাজ বন্দরে ফেরারী
হাত ফুল পালটায় টেবিলক্লথ চায়ের সসার কাপ
দুই ঘরে দুই মনের কথার অনেক ফাঁক
অনেক ফাঁক
কলহভিটের ফাঁকা যেখানে নিঃশব্দের অশরীরী
যাতায়াতের পথে নোটবুক ভরিয়ে ফেলছে
আর চোখ তুলে পতিত পরীদের দেখে -
শেষ ঘন্টার বারে ফুরনো গেলাসের ভেতর
স্বগতোক্তি আর স্বীকারোক্তির গাঢ় কনককশনে
সিলিঙের চুমকি তারা এসে পড়ে

আর চিকচিক করে রাঙাপ্লাবনের নক্ষত্রজল

====

ধ্বনির সমন্বয়েই হয়তো এমন হলো। বৃষ্টির শব্দ আর ঘন্টাধ্বনির রূপকথ্য মিশ্রণের সুযোগ নিয়েই সেদিন অনিমেষ ও সুশান্ত আমাকে দেখাতে পেরেছিলো কীভাবে সামুদায়িক স্মৃতির হেরফের তারা করতে পারে। আরো বিস্ময়কর কিছু ঘটছিলো সেই মুহূর্তেই যা আমি পরে জানতে পারি। ঠিক কীভাবে জানতে পারি আজ আর তা মনে নেই। বাবলুর মতো আমারও কিছু হয়েছিলো ঠিক। এসব অনিমেষ আর সুশান্তেরই কাজ, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। ওই বৃষ্টি আসার পূর্ব মিনিটেই সন্দীপন ও অন্যান্যরা পুস্তিকাসমাহার থেকে বেরোয় আকাশের অবস্থা দেখে। সন্দীপনের সাথে ছাতা ছিলো। কিন্তু অনেকের কাছেই ছিলো না। মালবিকার কাছে তো নয়ই। ফলে তারা সহজেই একই ছাতার নিচে চলে আসে। একটুখানি এগোতেই একটা ফাঁকা অটো পায়। উঠে পড়ে। অল্প কথা বলছিলো তারা। সামনের রাস্তায় মেরামত চলছিলো, কাঁচা রাস্তা বৃষ্টিতে ভিজে অগম্য হয়ে উঠতে পারে, এই ভয়ে অটোচালক ওদের জিজ্ঞেস করেই গলির মধ্যে গাড়ি নেয়। একটু ঘুরে যাবার পথে বাবলুদের বাড়ি। তার পাশ দিয়ে যাবার সময়েই সহর্ষে বৃষ্টি আসে। সঙ্গে ঘন্টার তীব্র শব্দে চমকে উঠে মালবিকা সন্দীপনের ডানহাত ধরে। এতে সন্দীপনও চমকায়, একবার ঘুরে মালবিকাকে দেখে শান্ত সংহতভাবে। তারপর তার ডানহাতের তালু মালবিকার বাঁ হাতের তালুর সাথে মিলে যায়। অটো অলিগলি ঘুরতে থাকে ঘন্টার শব্দের মধ্যে, ওরা সলজ্জ ওইভাবে বসে থাকে নিঃশব্দে। দুজনেই টের পায় রক্তের এক উপদ্রুত সঞ্চালন মিশছে হাতের তালুতে। সেটা উঠতে উঠতে কনুই অব্দি। সেদিন বাড়ি ফিরে তারা টের পায়...

সন্দীপন টের পান খেতে বসে। ভাতের মধ্যে ডাল ঢেলে মাখতে গিয়ে লক্ষ্য করেন– তার ডানহাতটা যুবকের। একটা হাত বুড়ো আর অন্য হাতটা যুবক। তালুর আকার অল্প ছোট হয়ে গেছে, রোম কম, ত্বক মসৃণ, পেশি বেতস। আর মালবিকা টের পান স্নানের সময়। ওর বাঁ হাত। বিশেষত হাতের পাতা যেন নতুন বটপাতার মতো নরম, চেটালো, মসৃণ। অথচ দুজনেরই একে অন্যকে তখন মনে পড়েনা। মনে পড়ে না সেই অটো-মুহূর্ত, সেই একসঙ্গে ফেরা। বাবলুদের বাড়ির ঘন্টাধ্বনি, সেই হাত চেপে ধরা। পুস্তকসমাহার-এ ওদের দেখা হয় আগের মতোই। নানারকম কথাও হয়। দুজনেই তাদের ওই হাতদুটো নিজেদের থেকে লুকিয়ে রাখেন, যেমন অন্যদের থেকেও। দুটো হাত, যৌবন ফিরে পাওয়া হাত, বিজ্ঞানরহস্য হয়ে থেকে যায়। সন্দীপন কয়েকবার ডাক্তারের কাছে যাবেন ভেবেওছিলেন। কিন্তু পরে ভয় পান। কেননা একটা অস্বচ্ছ স্মৃতি মাঝে মাঝে মনের কোণে গড়িয়ে পড়ে প্লেটের কোনের ঝোলের মতোই...মনে পড়ে বিপরীত লিঙ্গের সাথে কী যেন একটা হয়েছিলো... হয়তো এই হাত পাপের ... বা হয়তো তুলনাহীন মঙ্গলের...

====

অবতলে
বিন্দু গড়িয়ে পড়ছে হাসের পালক ঝকঝকে
বাড়ি বাড়ি এখন তারাই পোষ্য
নিশ্চুপ নিরবচ্ছিন্ন নির্বাক হংসীরা

হাতই এখন হাতিয়ার
আপৎকালীন শান্তি ও স্বস্তির খোঁজে
একে অন্যের স্পর্শ স্পন্দনের
তিল তিল দানা দানা নীরবিন্দু গ'ড়ে তুলে
ঝাঁপিয়ে পড়ে আগুনের ওপর
তাকে নেভায়

জমির ওপর দেশের ওপর বিবিধ ভূ-সংস্থানের ওপর
বোলানো হাত
সমুদয় শরীরের তাপমান জানে

====

যখন বৃষ্টি নামে মুষলধারায়, অক্ষয়া তখন বাজার থেকে খই, শাপলা আর বড়ি কিনে বেরোচ্ছে। বাবলুদের বাড়ির কাছেই বাজার। সেখানে একটা ড্রেনের কাছে সে দাঁড়িয়ে পড়ে এক বাড়ির জানলার কার্নিসের নিচে। আজীবন জমাদারি ক'রে অক্ষয়ার একটা অভ্যেস তৈরি হয়ে গেছে। সে মাটির দিকে খুব চায়। রাস্তার খুঁটিনাটি তাকিয়ে দেখে মন দিয়ে। কোন রাস্তায় কী বদলালো তার চোখে পড়ে যায় সবার আগে। নানা ড্রেনের ঝাঁঝির চরিত্র সে চেনে। এই ড্রেনটা সত্যিই অদ্ভুত...

আয়তাকার। কিন্তু আয়তের অর্ধেকটা রাস্তার ওপর বাকিটা ৯০ডিগ্রি বেঁকে ওপরে উঠে বাড়ির গায়ে। এক প্রাচীন বিলিতি বাড়ির গায়ে। কে জানে কাদের বাড়ি। এখন কে থাকে কে জানে! সেই ড্রেন থেকে মাঝে মাঝেই একটা সুন্দর গন্ধ বেরয়। রাস্তার লোকে এই জায়াগাটায় ভিড় করে। হয়তো নিজেদের অজান্তেই টোপের দিকে ধেয়ে আসা মাছেদের মতোই ড্রেনের

কাছে দাঁড়ায়। অনিমেষ ও সুশান্তকেও ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। একদিন কে যেন তার বন্ধুকে চিৎকার করে বলছিলো - 'ইমোশনাল ড্রেন'। যত মনের বর্জ্য বস্তু, সমাজের কাজে না-লাগা বস্তু, ওখানে দাঁড়িয়ে বাক্যালাপ চালানোর সময়, চা-পানি খাবার সময় লোকে ফেলে দিয়ে যায়। কালবৈশাখীর সময় সমস্ত বাসী ফুল পাতাও সব উড়ে এসে ওখানে পড়ে। এটা অক্ষয়াও লক্ষ্য করেছে। নালা-সৌরভের ইতিকথার শুরু ওখান থেকেই - সামষ্টিক প্রেম, ভালোবাসা, কৃপা, মমতা, ফেলে দেওয়া দুধের বোতল, মধুর শিশি সব ওই ড্রেনে যাচ্ছে। সেখান থেকে শহরের পয়ঃপ্রণালীতে মিশে কী যেন শুদ্ধ ক'রে দেয় শহরের তলায় তলায়। যারা সৌরভি বা পারফিউম-মেকার তাদের কাছে খবর গেলে ব্যাপারটা জমবে কিন্তু...

যাইহোক, সেদিন বিকেলে যখন বৃষ্টি এলো আর বাবলুদের সিঁড়ি বেয়ে কাঁসার ঘন্টা গড়িয়ে পড়ছে আর তার ধ্বনিতে ম্লান হয়ে যাচ্ছে শহরের সমস্ত মন্দির, অক্ষয়া ওখানে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেছিলো দুটো ছায়ার মতো ধোঁয়ামানব কী যেন একটা ধরাধরি ক'রে ঠিক ওই ড্রেনের ওপর মিলিয়ে যায়। আর শহরের সমস্ত ফুল ও ফলের দোকান থেকে নানা ছোটো ছোটো সুবাতাস মিছিলের মতো জমা হচ্ছে...

====
বাড়ির ভেতরে ব'সে কীভাবে বাড়ির বাইরেটা
মনশ্চক্ষুতে ধরা যায় দেখা দেয়
বাগানের গুলঞ্চ ভাঙা পাখির ডিমের ভেতর
পিঁপড়ের স্টেডিয়াম
ছোটঝিলের নুড়িদের আপন অসতর্ক নড়াচড়া
টানেলের ভেতর থেকে আকাশের সব কোণ
সব কটা জঙ্গি বিমান গোণা যায়
শুধু আমরা জানবো টানেলে কেউ নেই
ওখানকার ট্রেনলাইন ওপড়ানো ওখানে শুধু
যারা চুম্বনভিখারি তারা
যারা স্মৃতিসন্ধানী তারা আর যারা
ঘ্রাণেন অর্ধজীবন
====

লেখার শেষ পঙক্তিতে এসে এটুকুই বলার যে অনিমেষ-ও-সুশান্ত রহস্যের সবটা আমি এখনো জানিনা। এছাড়া ডি ডব্লু গ্রিফিথের একটা উক্তি মনে পড়লো – 'Cinema was born from the slime of the earliest oceans. To view a film is to return to a primitive state'।

লেখসূত্রঃ

1. উইম ওয়েন্ডার্সের ছবি 'উইংস অফ ডিসায়ার' বা সরাসরি জর্মণ থেকে বাংলা অনুবাদে - 'বার্লিনের স্বর্গ' (১৯৮৭)-র প্রেরণায় এই রচনা। ইংরেজি কাব্যাংশ ছবির অবশীর্ষক থেকে নেওয়া। বাংলা কাব্যাংশ আমার নিজের। সিনেকবিতা।
2. লেখার সঙ্গে ব্যবহৃত সমস্ত ছবি 'বার্লিনের স্বর্গ' ফিল্মের স্থিরচিত্র।

== ।। ==

প্রথম প্রকাশঃ কবিসম্মেলন, জুন ২০১৩